# অবন ঠাকুর : স্মরণ মালিকা

**যে বই বারবার পড়া যায়, পাতা উল্টে দেখা যায় তেমনই একটি বইয়ের আলোচনা সন্ধিনী রায়চৌধুরী-র কলমে।**

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা উমাদেবী রচিত 'বাবার কথা' গ্রন্থটি আপাত বিচারে স্মৃতিচারণ কিন্তু তথাকথিত জীবনীগ্রন্থ নয়। অবনীন্দ্রনাথের গোটা জীবনের নানা চূর্ণমুহূর্ত, পূর্ণ অভিজ্ঞতা, পূর্ণতর উপলব্ধির একজন সংবেদনশীল দ্রষ্টা যেন উমাদেবী। এই দ্রষ্টা আবার একজন নিপুন কথকও বটে। লেখিকার পিতৃতর্পনে অতীতের স্মৃতি ও ঘটনাবলীর সংযোজনায় আমরা যেন মানবজীবনের একটা বিরাট ক্যানভাসে অবনীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষ করতে পারছি। বাংলায় প্রথম আত্মচরিত 'আমার জীবন' (১৮৬৮) রচনা করেন রাসসুন্দরী দাসী (১৮০৯-১৯০০)। এরপরে ঠাকুরবাড়ির আরো কিছু মানুষজনের কথা এসে পড়ে যাঁরা তাঁদের স্মৃতিকথা / আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন ভাবীকালের পাঠকদের জন্য। রাসসুন্দরী এবং ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের পথ অনুসরণ করে উমাদেবী লেখেন 'বাবার কথা'। তিনি না লিখলে অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক ঘরোয়া কথাই আমাদের অজানা থেকে যেত। আমাদের অদেখা আশ্চর্য এক অবনঠাকুরকে উমাদেবী তাঁর নিরাবেগ কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার ভিতরে বাঁধা থাকে মস্ত বড় মন। অবনীন্দ্রনাথের সেই মনের ছবি ধরা আছে উমাদেবীর কলমে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই যখন বিপত্নীক অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গিয়ে থেকেছেন তখন রাণী চন্দকে মুখে মুখে নিজের জীবন-কথা বলতেন। এরপরে রাণী চন্দের অনুলিখনে প্রকাশিত হয় অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ 'ঘরোয়া' (১৯৪১) এবং 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৯৪৪)। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার কথাবার্তা আর একটি যে গ্রন্থে ধরা আছে তা হল 'শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ'। 'বাবার কথা' বইটিতে উমাদেবী রাণী চন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন রাণী বাবার কাছ থেকে তাঁর জীবনকাহিনী শুনে যে লিখে ছাপিয়েছেন এটি একটি মস্ত বড় কাজ। লিখেছেন : 'তাঁর জীবন কাহিনী তাঁর নিজের মুখের কথা শুনে ছাড়া অমন সুন্দর করে কেউ লিখতে পারবে কিনা সন্দেহ।' আর নিজের জবানীতে বলতে চেয়েছেন যে তাঁর বাবার দীর্ঘ জীবনের ঘটনাবহুল কাহিনী লেখবার মত শক্তি তাঁর নেই বলে –

খাপছাড়াভাবে ‘কত কথাই মনে পড়ে। যেমন যেমন মনে আসছে ঠিক তেমনি বলে চলেছি। খণ্ড খণ্ড মেঘের মত, এক একটি ঘটনা। তাতে হয়তো একটানা কিছু নেই, তবে অনেক ছবি পাওয়া যাবে তাঁর দীর্ঘ জীবনের।’ স্মৃতিকথার ধর্মই বুঝি তাই। স্মৃতি সরণি ধরে ফেলে আসা জীবনের ছবিগুলি আসে আপন খুশিতে। চলেও যায় তারা আপন ইচ্ছায়। ছবিগুলি হয়ে ওঠে ইতিহাসের অঙ্গ। এইরকম অজস্র ছবিতে পরিপূর্ণ স্মৃতির অ্যালবাম থেকে উমাদেবীর কলম-ক্যামেরায় ধরে রাখা কয়েকটি ছবির কথা তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়েই আজকের এ লেখার সূত্রপাত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

‘আমার বাবা’ বইটির ছত্রে ছত্রে অবনীন্দ্রনাথের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে একাধারে তিনি যেমন স্নেহশীল পিতা তেমনি কর্তব্যপরায়ণ সন্তান, পত্নীগতপ্রাণ স্বামী এবং পরিবার পরিজন সকলের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকা মস্ত বড় মনের একজন মানুষ। এই শান্তিপ্রিয় মানুষটিকে কখনও চুপ করে বসে থাকতে দেখা যেতো না। যে কোন বিপদে আপদে – সে বাড়ির দাস-দাসী, আমলা-সরকার, আত্মীয়-পরিজন যাঁরই হোক না কেন সবার আগে তিনিই গিয়ে দাঁড়াতেন। এসব কিছুর মধ্যেও তিনি নিয়মিত পড়াশোনা, লেখা এবং ছবি আঁকার কাজ করে যেতেন। আত্মজনদের মৃত্যুতে শোক মুহ্যমান হয়ে অনেক সময় সাময়িক বিহ্বলতা দেখা গেলেও তাঁর অন্তরের কর্মব্রতী শিল্পীমন জেগে ওঠায় আবার নিবিষ্টভাবে আপন কাজে লিপ্ত হয়েছে। নিজের সাধনার পথে এগিয়ে চলেছেন দৃঢ়ভাবে। অন্তর্মুখী মানুষটি বহির্জীবনের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দোলন ও রাখীবন্ধন উৎসবের অন্যতম সঙ্গী শুধু নয়, কর্ণধারও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একের পর এক জাতীয় ও স্বদেশী সঙ্গীতগুলি লিখে যেতেন আর রং তুলিতে সেই ছবির রূপ দিতেন অবনঠাকুর। তাই ‘বঙ্গমাতা’ ছবিতে ফুটে উঠলো ‘আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি / তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হ’লে জননী।’ তাঁর সাধনার বৈশিষ্ট্য এই যে, সব বিষয়ে নিজেকে জড়িয়ে, সকলের ডাকে সাড়া দিয়েও নিজের কাজ ঠিক ক’রে যেতেন। সাধনা আর সংসার তাঁর কাছে আলাদা ছিল না ব’লে হয় আঁকা, নয় লেখা – সেও তো ভাষার রং দিয়ে একরকম আঁকার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন।

কলকাতায় যখন প্লেগ মহামারির আকার ধারণ করলো তখন সেই মারির হাওয়া গ্রাস করলো অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যাটিকে। ফুলের মত কন্যাটির মৃত্যুশোকেও কর্তব্যকর্মে অবিচল থেকে অবনীন্দ্রনাথ ডাক্তারের পরামর্শে বাড়িটি চুনকাম করা হবে বলে পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে এলেন মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের বরানগরের ‘তটিনী কুটির’ ও

‘সুরধুনী কাননে’। কন্যাহারা শোকগ্রস্ত স্ত্রীর মন ভুলিয়ে রাখবার জন্য তাঁকে অনেকরকম পাখি কিনে দিতেন। বাচ্চা টিয়া, চন্দনা, ময়না কিনে তাদের অতি যত্নে মুসুর ডাল সিদ্ধ, ছাতু ইত্যাদি খাইয়ে বড় করে তারা যখন খেতে শিখতো, ডানা মেলে উড়তে পারতো, তখন তাদের আকাশে উড়িয়ে দিতেন। মনে হয় ভাবতেন – নিজের মেয়েকেই যখন ধরে রাখতে পারলাম না, পাখির ছানাকে রাখবো কেমন করে? কোন পাখির অসুখ হলে বইপত্র ঘেঁটে ওষুধ বার করে তা খাইয়ে পাখিকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতেন, তবু যখন মৃত্যুর লক্ষণ দেখা যেত, তিনি শেষ পর্যন্ত পাখিটিকে নিয়ে বসে থাকতেন স্থিরভাবে। এই পাখির মৃত্যুর ভিতর দিয়ে নিজের মেয়ের মৃত্যুকে সহজ ভাবে মেনে নেবার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে কন্যাশোকের খানিকটা উপশম করাও বুঝি তাঁর সাধনার একটা ধারা ছিল। এই সময়েই তিনি রাজস্থানের ইতিহাস থেকে ছবি আঁকছিলেন। নিজের অন্তরের সমস্ত বেদনা, বিয়োগ-ব্যাথা ঢেলে দিয়ে অয়েল পেন্টিং-এ এঁকেছিলেন ‘শাজাহানের মৃত্যু’। অবনীন্দ্রনাথের নিজের জবানীতে শোনা যায় কীভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি ‘শাহাহানের মৃত্যু’ অঙ্কিত হয়েছিল : ‘তখন আমার মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। শোকে তাপে আমি জর্জরিত। হ্যাভেল সাহেব বললেন, করনেশন উপলক্ষ্যে দিল্লীতে একজিবিশন হচ্ছে। তুমি একটা কিছু পাঠাও। আমি কি করব, মনও ভালো না। রং তুলি নিয়ে আঁকতে আরম্ভ করলাম। আমার মেয়ের মৃত্যুজনিত সমস্ত শোক আমার তুলিতে রঙীন হয়ে উঠলো। শাহজাহানের মৃত্যুর ছবি আঁকতে আরম্ভ করলাম। আঁকতে আঁকতে মনে হয় সম্রাটের চোখে-মুখে, তার পিছনের দেওয়ালের গায়ে আমার সেই দুঃসহ শোক যেন আমি রঙীন তুলিতে করে ভরে দিচ্ছি। ছবির পিছনের মর্মর দেওয়াল আমার কাছে জীবন্ত বলে মনে হয়। যেন একটা আঘাত করলেই তার থেকে রক্ত বের হবে। দিল্লীতে সেই ছবি প্রথম পুরস্কার পেল।’ (‘ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়’ – জসীমউদ্দীন) ‘শাজাহানের মৃত্যু’ ছবিটির জন্য অবনীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন সোনা ও রূপোর মেডেল।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সাংসারিক জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন কিন্তু ছবি আঁকার জীবনেও তাঁর দুঃখের অন্ত ছিল না। তিনি নিজেই বলেছেন, ‘শিল্পীর জীবনটা দুঃখের। কবির জীবন অনেক ভালো। লেখার মধ্যে দিয়ে ভাব ফোটানো অনেক সহজ কিন্তু তুলির সাহায্যে মনের মত ছবি আঁকা বড় শক্ত।’ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে যে বাল্যগ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রথম বই ‘ক্ষীরের পুতুল’ (শ্রাবণ, ১৩০২)। তারপর ‘শকুন্তলা’, ‘বুড়ো আংলা’ আরো কত বই। বেশীরভাগই ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে। বইটি লেখা হলে যেমন বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ে শোনাতেন তেমনি আবার অবনীন্দ্রনাথের মুখে মুখে বলা গল্পগুলির মধ্যে একটা আশ্চর্য জাদু ছিল – কী যে ভাব দিয়ে বলতেন! দুঃখের সময় কাঁদাতেন, হাসির সময় হাসাতেন – শুনতে শুনতে শিশুরা গল্পের রাজ্যে চলে যেতো। ছোটদের জন্য যেমন লিখতেন, আঁকতেন তেমনি খেলনাও তৈরি করতেন।

অবনীন্দ্রনাথ যখন বৈষ্ণব পদাবলি থেকে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র আঁকছেন তখন নিজের বাড়ির বাগানে অনেক কোকিল, শালিক, ময়না পাখি কিনে এনে ছেড়ে দিতেন। নিজের বাড়ীর মধ্যেই তিনি বৃন্দাবনের রূপ দেখতে চেয়েছিলেন। শিল্পীর চোখে যা দেখতেন তাইই ধরে রাখতেন রংতুলির সাহায্যে।

প্রতিবছর নিয়ম করে গরমের সময় বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার আয়োজন চলতো। কোন কোনবারে জোড়াসাঁকোর বাড়ীশুদ্ধ সকলেই যেতেন। তা যদি সম্ভব না-ও হতো তবে অবনঠাকুর সপরিবারে যেতেনই। বেড়াতে গিয়ে যেখানে যা ভালো লাগতো তা যেমন এঁকে ফেলতেন তেমনি আবার মনশ্চক্ষে কোন দৃশ্য কল্পনা করে যেমনটি আঁকতেন তা প্রকৃত বিষয় বা ঘটনার সঙ্গে হুবহু মিলে যেতো। এ-ও এক আশ্চর্য প্রতিভা।

পুরীতে বেড়াতে গিয়ে তাঁর একবার সখ হল কোণারক দেখতে যাবার। পুরী থেকে রাত আটটার সময় পাঁচটা পাল্কিতে ভাগাভাগি করে বসে রওনা দেওয়া হল ভোরবেলায় চন্দ্রভাগায় সূর্যোদয় দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রত্যেক পাল্কিতে আটজন করে বেহারা, একটি করে লণ্ঠন নিয়ে সমুদ্রের ধারে ধারে ধূ ধূ বালির মধ্যে পথ করে নিয়ে দুলকি চালে চলছে – চাঁদনী রাতে বেহারাদের বোল্ শুনতে শুনতে গা শিউরে ওঠা পথে অভিযান। এই কোণারক যাত্রার পরেই অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন 'ভুত পতরীর দেশে'। উমাদেবী বর্ণিত এই ভুতুড়ে রোমাঞ্চকর কোণারকের যাত্রাপথই হল 'হুম্পাহুমা পালকি চলেছে বনগাঁ পেরিয়ে, ধপড় ধাঁই পালকি চলেছে বনের ধার দিয়ে, মাসির ঘর ছাড়িয়ে, ভুতপতরীর মাঠ ভেঙে, পিসির বাড়িতে।' –র উৎস। উমাদেবীর স্মৃতিতে আরো আছে রাজকাহিনী পড়ার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। দূর থেকে কোণারকের মন্দির দেখে মনে হয় বিরাট পাথরের রথ যেন বালিতে খানিকটা বসে গেছে – ঠিক যেমনটি ছিল তাঁর বাবার লেখা সূর্যমন্দিরের বর্ণনায় 'শিলাদিত্য' কাহিনীতে।

অবনীন্দ্রনাথের এসরাজের হাত ছিল খুব ভালো, যদিও অন্যান্য যন্ত্রে তাঁর অল্পবিস্তর দখল ছিল তথাপি এস্রাজ ছিল তাঁর সবচাইতে প্রিয় বাজনা। আমাদের অতি পরিচিত একটি আলোকচিত্র – গান গাইছেন রবীন্দ্রনাথ, পাশে এস্রাজে সংগত করছেন অবনীন্দ্রনাথ। এস্রাজ শিখতে শুরু করেছিলেন একটা শখ থেকে।

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর লেখা নাটক মঞ্চস্থ করতেন তখন মঞ্চসজ্জা ও অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সাজসজ্জার ব্যবস্থাপনায় থাকতেন অবনীন্দ্রনাথ। এছাড়াও শিশির ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরীরা প্রায়ই আসতেন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে অভিনয় সংক্রান্ত আলোচনা ও পরামর্শ করতে। তাঁদের নাটক দেখাতে নিয়ে যেতেন অবনীন্দ্রকে। অভিনয় ছাড়া গান-বাজনা শোনার ও নাচ দেখার খুব সখ ছিল। নিজে অভিনয় করতে গিয়ে সবসময় কমিক পার্ট নিতে ভালোবাসতেন বলে রবীন্দ্রনাথ নাটক লেখার সময় অবনীন্দ্রকে মনে করে একটা কমিক পার্ট রাখতেন। গুণীকে খুঁজে চিনে নেবার একটা অসাধারণ শক্তি ছিল অবনঠাকুরের,

তাই যার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য বা সাতন্ত্র্য খুঁজে পেতেন তাঁকে সকলের মাঝে তুলে ধরতে পারলে খুব আনন্দ পেতেন।

অবনীন্দ্রনাথ সারাজীবন অনেক শোক-তাপ পেয়েছেন। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে যখন তাঁর মেজো মেয়ে করুণা দুটি ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা গেলেন তিনি তখন শোকে মুহ্যমান। ছবি আঁকা বন্ধ,কিন্তু সেই দুরন্ত শোকেও করুণার ছেলেমেয়েদের গল্প শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। ছোট ছেলেরা তাঁকে তাদের মতই ভাবতো, তাই কথাও বলতো সেইভাবে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর মধ্যে একটা শিশুমন ছিল নির্মল আকাশের মত।

ছাত্রদের জন্য তাঁর স্নেহপ্রবণ কোমল মনটি ছিল বড়ো ঘরোয়া। ছাত্রদের উপর স্নেহমমতা ছিল ঠিক নিজের ছেলের মত। উমাদেবীর জিজ্ঞাস্য ছিল : 'বাবা, তুমি এতে আঁকো, এগজিবিশনে দাও না কেন?' প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, 'ওরে, আমার ছবি দিলে ছাত্রদের ছবি বিক্রি হবে না যে। তাই দেইনি।' ছাত্রদের নাম, যশ হোক, তারা উন্নতির শিখরে উঠুক – এইই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। অবনীন্দ্রনাথের পড়াশোনা যেমন অগাধ, স্মৃতিশক্তিও তেমনি প্রখর। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি শিল্পকলা সম্পর্কিত যে বক্তৃতাগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছিলেন তা তাঁর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলার ভঙ্গিতে শ্রোতাদের এতটাই আপ্লুত করে রেখেছিল যে প্রত্যক্ষদর্শী উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'বক্তৃতা তো নয়। সে-ও এক ছবি দেখা। ... চমক ভাঙে বক্তৃতা শেষে। মনে হয় স্বপ্নলোক থেকে আবার ফিরে আসি মর্তলোকে।' এই বক্তৃতাগুলিই 'বাগীশ্বরী প্রবন্ধাবলী' নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। কবিগুরুর মৃত্যুর পরে অবনীন্দ্রনাথ কিছুদিন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের স্থলাভিষিক্ত হয়ে আচার্য হিসাবে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের গান-বাজনা, অভিনয় আর সাহিত্যের পথে পয়লা নম্বরের উৎসাহদাতা। রবীন্দ্রনাথ বলতেন আমাদের লক্ষ্যস্থল একই, কিন্তু রাস্তা দুটো আলাদা। সত্যি, শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি গ্রহণযোগ্য, কিন্তু ঘরোয়া জীবনে দুজনের মধ্যে পার্থক্য ছিল বিস্তর।

বড়ো ঘরোয়া আর নির্মেঘ আকাশের মত প্রশস্ত, ও মহৎ ছিল অবনীন্দ্রনাথের স্নেহপ্রবণ মনটি। একদিন উমাদেবীকে বললেন : 'জানিস, কোথা থেকে না আমন্ত্রণ

পেয়েছি। দিল্লী, লাহোর, জয়পুর, বম্বে, মাদ্রাজ, মহীশূর, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান, চীন সব জায়গা থেকে আমায় ডেকেছে। কেন যাইনি জানিস? তোর মাকে একলা রেখে যেতে হবে বলে। বড়ো ভীতু ছিল সে।' সবসময় সকলকে কাছে নিয়ে থাকবেন এই ছিল তাঁর মনোবাঞ্ছা। বাইরে যতই নাম যশ হোক্ না কেন, অন্তর ছিল একান্ত আত্মীয় বৎসল। মেয়েদের কাছে পাবার জন্য বিয়ে দিয়েছিলেন কাছাকাছি, কিন্তু শেষ বয়সে শরীর যখন খুব খারাপ বলে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসেছেন বরানগরে 'গুপ্তিনিবাসে' তখন গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উমাদেবীকে বলেছিলেন : 'কোথায় রইলো সে (করুণা, প্রয়াত মধ্যম কন্যা), কোথায় রইলি তুই, আর কোথায় রইলুম আমি।' এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের অমিলটা চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর প্রতি প্রেম, অনুরাগ, শ্রদ্ধা, অভিমান, সবই ছিল গভীরভাবে। একদিন চিঠি পেতে দেরি হলে মন ভারী হয়ে উঠতো। মৃণালিনী দেবীর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন, এমন কী পরলোকচর্চাও করেছেন, কিন্তু এর পাশাপশি এটিও সমান সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত সাধনাকে স্থান দিয়েছেন সবার ওপরে। বন্ধু-বান্ধব, সংসার, স্ত্রী-পুত্র কোন কিছুই তেমন করে আঁকড়ে ধরেননি। ভিতরে একটা জায়গায় তিনি নির্মম। তা না হলে তাঁর 'ক্রিয়েটিভ মাইন্ডে'র উৎকর্ষতা সাধনে ব্যাঘাত ঘটতো। রবীন্দ্রনাথ বহির্জীবনে সকলের মাঝখানে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে ভালোবাসতেন আর ঠিক তার বিপরীতে অবনঠাকুর নিজেকে ধরে রাখতে চাইতেন।

শেষ জীবনে তিনি ছবি আঁকাও প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। 'বাবা, তুমি আর ছবি আঁকো না কেন?' উমাদেবীর এ প্রশ্নের উত্তরে অবনীন্দ্রনাথ বলেন : 'মনে আর রঙ ধরে না তো আঁকব কি? এখন আমার এই কাটুম-কুটুমই ভালো।' সে সময় গাছের ডাল, এটা-ওটা-সেটা নানা অকাজের জিনিস দিয়ে সুন্দর সুন্দর খেলনা গড়ে কাঠ-কাঠরাকে রূপ দিতেন।

উমাদেবী তাঁর 'বাবার কথা' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের জীবনী নয়, তাঁর অন্তরের অন্দরমহলের স্নিগ্ধ ছবিগুলির কয়েকটি টুকরো যেন তুলে ধরেছেন। বাবার জীবনের নানা ঘটনা যেমন যেমন তাঁর মনে এসেছে তেমনি খাপছাড়াভাবেই বলে গিয়েছেন। তাই এতে কোনো ধারাবাহিকতা নেই। বইখানির কলেবর ছোট হলেও এতে এমন অনেক স্মরণীয় তথ্য আছে যা অমূল্য। সর্বোপরি দেজ পাবলিসিং এবং স্কুল অফ উইমেনস্ স্টাডিজের প্রকাশনায় সুদৃশ্য ছাপা ও বাঁধাই এর দরুন বইটি সুখপাঠ্য হয়েছে। অবনঠাকুরের শেষ জীবনের নিরাসক্তির কথা পড়তে পড়তে মন ভারী হয়ে ওঠে। বইটির সঙ্গে এমনই একাত্ম হয়ে যেতে হয় যে পাঠ শেষে মনে হয় আমাদের বড়ো আপন একজন সুদূরের বাঁশরি শুনে সত্যি চলে গেলেন সব কাজ চুকিয়ে।

চিত্র পরিচিতি : ১। *বাবার কথা* বইটির প্রচ্ছদ। ২। শিল্পী খালেদ চৌধুরীর আঁকা স্কেচ। ৩। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা *শেষ যাত্রা* ।